নিস্তরঙ্গের বীতস্বরে

১.

ব্যক্তিগত ধুলিঝড়
আয়ত চোখ, তবে মৃত্যুমুখোশ পড়ে শীতল
রাত্রি বিলোসনে

তখনও আমার কোনো পথঘাট চেনা ছিল না
তখনও আমার চোখে কান্না আসে নাই
তখনও আমার বৃষ্টির ধারণা ছিল না
তখনও আমার বাবা-মা কাছে আসে নাই

সকল ধারণা ভুলে সমবেত
বীতস্বরে করি বন্দনা তোমার
তুখোড় অভিমান ছিঁড়ে ফেলে
অসুখে-বিসুখে;

বনের বিকাসনে সঙ্গত শব্দ শুনি

আসছিলাম দ্রুত পায়ে সহস্র পথ ধরে
মনন্তর ও মদনোৎসব থেকে
একে একে প্রপঞ্চের মায়া ও প্রচ্ছায়া ভেদ করে;
কাঁধে ছিল অযুত ঋণের বোঝা...

সভ্যতার সেসব আলোকিত প্রতিলিপি
তুমি তো পড়েছ বহুবার
স্বকণ্ঠে গেয়েছ নামতাবলী।
তবু আজ উড্ডীন অন্তর্গামী ঝুলিঝড়;
ব্যক্তিগত সাম্পানে চড়ে ভেসে যাচ্ছি
 যে কোথায়!

উপনিষদের সেইসব বিভ্রাটের ছায়া
আজ ভাসিয়ে দেব, মুঠোয় তুলে নেব
তার পাশ থেকে শ্মশানের ছাই

আমার গন্তব্য পথে তখনও কোনো পথিক ছিল না
আমার গন্তব্য পথে তখনও কোনো প্রেমিক ছিল না
আমার গন্তব্য পথে তখনও নদীর ধারণা ছিল না
তখনও আমি ছিলাম একা
শুধু একা সজারুর কাঁটার মতো টান!

২.
দ্বিধাগ্রস্থ

বারবার উড়ে ঘাসে দগ্ধ
প্রজাপতির যুগল পাখা;
যেখানে মাঠ ছিল একাকি থরায়
ইসকুল পাঠে মগ্ন।

চিত্রের ফ্রেমে একান্তে বেড়েছি
পরস্পর... মুখপাত্রহীন;
ছায়াটুকু নির্ণয় করো, আর
লুকাবো না মুখ
অমন প্রস্তরোদে।

ফিরেছ তো সঙ্গে নিয়ে আকাশভর্তি মেঘ;
নিমেষ চোখে করেছো
বালিবাঁধ ভেঙে জলের বন্দনা;
হয়েছ বিনাশীও...
অনাবাদে ধানীজমি তাই হয়েছে উজার

তোমার আগুন দাঁতে!

৩.

মেঘহীন বাতাসে

চঞ্চল হাতের চাপে ভাঙে মাটির কলস
যতটা শঙ্কায় ফিরে আসে নৌকা
জলের বাতা ভেঙে

তারও অধিক- ধূপ দেওয়া চাতাল ঘরে
বিস্তৃত বর্ষা ছোঁয়ার কুশীলব নুয়ে পড়ে
শুভ্র শিশির ধানে- ঘ্রাণ হওয়া
মাঠ থেকে তুমুল বাতাসে

৪.
মাতাল

অচেনা আগন্তুক ঘোরে ফিরে আসে প্রতিবার
বাসনার বিপুল সম্ভবে নিঃসঙ্গতা লুট করে
আরও আসে পড়ে থাকা পোড়ামাটির দীর্ঘশ্বাসে।

নিস্ফলা প্রান্তর তখনও ছিল তৃষ্ণায় করুণ মাতাল;
গোধূলির কান্ত আলো থেকে নেমে আসতে দেখে
সে গোলকের ভেতর থেকে বলকে বলকে নেমে আসা
ধূসর পৃথিবীর বালিধারা;
তখন হারানো আঙুল খুঁজে তার হাত নামে
যুধ্যবন্দি চুলে, অবাক বিস্ময়ে উঠে আসে
প্রজাপতি সব; ক্ষীণকণ্ঠে বলে : বিভাসিত
স্বাদে দগ্ধ হও কত, ক্ষান্ত হও তো দেখি!

এমন দ্বন্দ্বমুখর দিনে নিরব স্মৃতিব্যথা বুকে নিয়ে
বুনো হাঁস ছুটে যায় পৃথিবীর মৌন মিছিলে।
দেখে কফিনে দ্রোণের আঙুল
শুধু নাচছে
শুধু
না
চ
ছে
ই

৫.
শূন্যতায় নির্বাক
যা নিয়েছ তুলে
প্রভোগে, সংমোহে,
নাও আরও কিছু
সমুদয় দুঃখ অতীত;
দূরের- সুদীর্ঘ রোদ্দুরের
পথ ঢেকে আসা
জীমূত সিয়ানো জীবন।

আকাশের উদ্বর্ত মাঠ
ভিজে আছে তেলরঙে তবু
ওপরে উঠছে আরও
হাওয়ায় হাওয়ায়
যেন খড়কুটো-
আটকে যাচ্ছে গোপনে...

আকাশের ঠোঁটে দারুণ কোলাহল...

তখন ঘুম জড়ানো তাবু ফেলে
সন্ধ্যায় একাকি- বনাঞ্চলে
ঢুকে পড়ি মোহের সঙযাত্রায়
পাখি, হাঁস আর কবুতরের সঙ্গে।
তারপর ত্রস্তপায়ের ছায়াগুলো
বিষাদে বিক্ষোভে
ঘ্রাণ টেনে হয় ভারি!

যা নিয়েছ তুলে
প্রভোগে, সঙমোহে
নাও আরও কিছু
সমুদয় দুঃখ অতীত;
চোখের জলেই দেখ
ভিজে ওঠা মুখ!

ছায়াপথ তোমার
জনশ্র“তির মতো
পরস্পর...
শূন্যতায় নির্বাক;
তবু বিস্তর বিন্যাসে
তোমার আশ্বাসে
ভেতর নড়ে উঠলে
টের পাই কম্পিত হাতে
জেগে ওঠা ঘাসের
আনত ভঙ্গী, তুলতুলে নরম আকাশ
মন্দির, সাঁকো আর
সব ধানের মায়া।

কিছু কবুতর তখনও বিদ্ধ
হতে থাকে যন্ত্রণায়...
আর দেহের মরমে হয় ভারী।

দুই.

কোঁচে গেঁথে ফেলার পর
আবারও অবলীলায় চূর্ণ করো
বিজলি আর সব নীবার।
অথচ শঙ্কায় থাকে দূরবর্তী মেঘ
না জানি কতটা মারণ অভিলাষে
ভেঙে দেবে-
সদ্য তোলা কাঁচামাটির ঘর!

নিম্নচাপে তোমারও বুক থরথর
নির্বেদে কাঁপে বালিয়াড়ি বাতাসে নির্মম;
অথচ আমি পিপাসার্ত, কাঙাল
হয়ে যাই বারবার
জুয়ারির মতো... যুক্তিহীন।

আচমকা না চেনা জলে তাই শিউরে উঠি
বহু আগে পরা শুকনো পাতার মতো;
যদি উড়িয়ে নিয়ে যায় অবশেষে
তুমুল বায়োকুড়ানি ঝড়!

৬.
ভেসে যাওয়ার উপাখ্যান
তারপর কুটোগুলো ভাসতে থাকে
ভেসে যায় ঢেউয়ের ধাপে ধাপে

আলগা হতে থাকে কোমরের গীট;
কোষগুলো খসে যায়... খসে যায়
ছিন্ন লাশের মতো ধীরে ধীরে...
ভাসতে থাকে- ভেসে যায়
গাইয়ের বাটনের মতো লম্বা হয়ে...

পালকিতে নবপরিণিতা যায় গাঁয়ে
যেতে থাকে আট বেয়ারার কাঁধে;
বেয়ারা ওঠানামা করে, সঙ্গে সেও;
যেমন বাজারের মুদ্রা দর ওঠানামা করে,
যেমন মাঝে মধ্যে সর্পিনী ওঠে সাপের ওপর

রাত বেড়ে যায়, বাড়তে থাকে আরও;
গহীন অন্ধকারে বাড়ে পাখিদের নিরবতা;
শিরিষ পাতা টুপ করে খসে যায়-
জমাট বাধে ঘন অন্ধকারে কুয়াশায়,
তারপর কুণ্ডলী পাকে- পাক খেতে থাকে;
খেতে খেতে ভেসে যায়- ভাসতে থাকে;
ভাসতে ভাসতে যেতে থাকে ঘন অন্ধকারে...

৭.

দেহপাঠ
শরীর কোষে ভাঁজ পড়ে
বালিকা দেহ;
ওষ্ঠের আদরে মৃতপ্রাণ দুপুর
প্রখর রোদ পেয়ে হাসে।
আমি ডাঙার চেতল-
নিকট অতীত ফেরি করি
শুধু বালিকা কাঁথানে।

নস্টালজিয়া
মনজুড়ে ক্ষুধা
বড্ড ক্ষুধা,
ঘুড়িপথে একা-
পাটাতনে ফ্রক মাথে ধুলি
আহা ধুলি!
দৈবক্রমে তা দেখা

দায়ভার

জেনেছো তো এখন মাঠকর্মী হয়ে
বাড়িবাড়ি ঘুরলে বিস্তারিত চেনাজানা হয়
পয়সা খোয়ানোর ভয় থাকে না একদম
তোলাও যায় ব্যক্তিগত সম্পর্কের সুদাসল।

তোমার আগেরজনরাও জেনেছিল একইভাবে
হাতে-কলমে এবং তাদের আগেরজনদের কথা শুনে

কেবল তোমার পরবর্তীজনরা বেশি বেশি আধুনিক
কাজে নামার আগেই পয়সা চেয়ে বসে
এই ক্ষুদ্রঋণের বিশ্বায়নেও... সামাজিকতা বোঝে না
যেন জ্ঞান-বিজ্ঞান মস্তিষ্কে জমাটবদ্ধ নেই
বোঝে না ক্ষুদ্রঋণতত্ত্বও

এ গাঁয়ের অধিকাংশই চাষাভূষা, ভূমিহীন অধিকতর
সুদাসলে সবটুকু বুঝে নিলে
সকালের ঘোর রাতেও কাটতে চায় না মোটে!

অভিজ্ঞান

অস্থির অভিজ্ঞানে শবের পিঠের যত আঁধার
পাথুরে পায়ের ভারে আমাকে দিয়েছিল
অনাবিল আবিষ্টতা, তারও অধিক ধ্যানে
বিদ্ধ করেছিলাম মোষেকুড়ো শ্মাশান-
ব্যাকুল ঠাকুরের বাড়ি।

অন্ধকারে সব জোনাকি ছিল তখনও ঘোরে
ফিরছিল একে একে আলোর মশাল হাতে।
তারা ডুবেছিল ভুলে শানবাঁধানো সংসারে
আসা অসংখ্য মানুষের মুখ পরিভাষায়।
গাছের মূর্তিমান আঠায় তারা ধরা দিয়েছিল
বিধিবদ্ধ চেতন।

জ্ঞানে-নির্জ্ঞানে চেনা-অচেনা জীবনতুলো মাঠে
ডানার ঝাপটায় কথা বলে তারা- জেগেও
ওঠে বিস্মৃতি নিয়ে;
বলে : রাত ও রাতের তারা যারা যায় ভুলে
পোড়াদেহের অনাগত গন্ধ তাদেরই বিদ্ধ করে;
এখানে যারা আসে, সবাই অনাগত- একেকটি ভাঁটফুল;
পোড়ানো শেষে সব ছাই উড়ে যায় বাতাসে...

তখনও গন্ধ ছিল শ্মশানে, পাশেই ছিল বিশাল কবর
সব নির্জনতা ভেদ করে ঢুকে পড়ি তারই ভেতর।

পাপ-পুণ্যের ছায়া ছুটে আসে... দেহ তুলে ধরে;
হাতে ধরিয়ে দেয় আগামী দিনের প্রশ্নখাতা...

ভেসে যাই আলো-অন্ধকারে জোনাকির সাথে
দূর বনে... মাতাল শহরে

একাকি পথে

হেঁটে হেঁটে যদ্দুর যাই,
পথে কারও দেখা নেই
গোপনে প্রাপক হতে চেয়ে
আজ এই নির্জন সন্ধ্যায়।
কাঁই কুঁই করবো উপায় নেই,
ছায়া যেন অন্ধÑ
ঢেকে আছে বিমূর্ত-কুয়াশায়;
বকগুলো উড়ে যাচ্ছে কোথাও-
কোনো কোলাহল নেই চারদিকে;
যাচ্ছি একাকি হেঁটে হেঁটে...

নির্জনে একাকি যেতে যেতে বাড়ে ভয়!
কবুতর নয়- দেখা হয়ে যায় কাকের সঙ্গে-
শেয়াল আর শেয়ালি মুদ্রণ করছিল পথ;
ওরা গৃহস্থবাড়ি যাওয়ার আগে নিজেদের
চাটে, ঘাটে- উল্টেপাল্টে দেখে নিল নিজেদের
শরীর আর সবকিছু করছিল নির্জনতায়- একান্ত গোপনে।
আমি তখনও পথে-
একাকি হেঁটে যাচ্ছি কুয়াশার ভেতর।

পথে কেউ নেই,
কারো কোনো দেখা নেই।
কুয়াশায় থাকতে নেই কারও!
গোপনে প্রাপক হতে চেয়ে
এই নির্জন সন্ধ্যায়।
নিস্তরঙ্গের বীতস্বরে

ফেরারিই ধরো, পরিচিত সবার
আব রূপ থেকে-
অথচ নিজেকেই করেছি নিজে
গুরুত্বহীন আজ অধিকতর!

চেনা সব যেন অচেনা বন্দরের মতো
ভাঙা জাহাজের রেলিঙ ধরে দাঁড়িয়ে আছে
অসংখ্য যাত্রীর ভিড়ে।

অথচ দূরত্ব জানি না কারও
ঘুরে ঘুরে ভাঙনের পথ;
ধাঁধার জটিলতায় বেঁধে রাখে পিঠে
দ্বৈত প্রাণের ছায়ায়-
বিমূঢ় অন্তঃপুরও!

ফেরারিই ধরো, কারও কারও
রাত্রির বঞ্চিত বেদনা থেকে
গড়ের মাঠটার মতো,
সে তো ফসলেরই মাতা!
অনতি চোখে কেবল তাকিয়ে দেখে
সন্তানসম্ভবা তার মেয়েটার শরীর থেকে
চুয়ে পড়া ফোঁটা ফোঁটা ঘাম।
আর সেসবের শোক প্রস্তাব এলে নীল বৃষ্টি থেকে
কারও কারও হাতে দেখি অহল্যার ঘুরির লাটাই!

ফেরারিই ধরো রক্ত মাংসে আমার দীর্ঘপথে...

একাকি নাকি কোনো সন্তাপে থাকতে নেই!

শিকার

একাই কী উঠেছে গড়ে জনারণ্যে প্রভূত সংসার
একাই কী ভেঙেছে আবার বিশাল সাম্রাজ্য তার
বুকে লুকিয়ে গজে ওঠা ঘাসের দীর্ঘ শব্দ-সম্ভার

প্রারম্ভে সবই ছিল আমাদের পরিচিত, চেনাজানা;
বাহুকা থেকে পাঁচঠাকুরির মধ্য দিয়ে দত্তবাড়ি
আমরা ফিরে আসি চার পাখি শিকারি।
উঠানে নতুন ধান- সোনালি সুখ পেয়ে হেঁটে ওঠে পায়ে
ঘুঙুর জোড়ানো তার মুগ্ধতার আঙুল- পৃথিবী;
ঢালে ধান হায় সকল বিষণ্নতায়...

এ দুপুর তোমার নয় পায়ে আলতা রাঙানো বিনে;
উঠানে ছড়ানো ধান- পাখি আসে নানা পথ ঘুরে
আসে শিকারিরাও ঘুরে ঘুরে, নেয় বাড়ি-ঘর চিনে।

চাষ

ঘুমের গলিপথ ধরে নেমে যায় পাহাড়ি ঢল
আজ এই মধ্যরাতে অস্থির বিছানায়; যেন
নতুন কাপড়ের মোড়কে নতুন সৃষ্টির বিস্ময়-
সম্পর্ক টানে তারা এসেছে মাঠ অথবা ডেক থেকে

কৃষক কিংবা নাবিকের মতো দ হয়ে।

তখন চোখের পাতা ছিঁড়ে কাদামাখা কাক
উড়ে উড়ে ছুঁয়ে দেয় ভাবুক এক রাত্রির
অবাঞ্চিত বেদনার হাড় আর তা ঝুরঝর হয়ে
দেহে ঢুকে গিয়ে নামে পানি হয়ে!
শব্দরা তখন খেলা করে মগজের গহীনে
বনের অজ্ঞাত থেকে বেরিয়ে আসে বিকার!

পার্শ্ববর্তী ঘরে তখনও চলছে ফসলের চাষ...

শীতসকালের বন্ধকী

কাঁধে ছায়া নিয়ে কোনো এক অজ্ঞাত পুরুষ
ফেরারি হয়ে এসেছিল আমাদের শীতসকালে।
পা ছিল তার নরম ঘাসের পেলবে মসৃণ, হাতে
ছিল বাঁশের বাঁশি। আমরা মুগ্ধ হয়ে তার পিছে
ঘুরেছি বহুদিন অনেক পথ!

কুয়াশার সব আয়োজন ভেদ করে সে আসতো
মাঠে; রৌদ্র তখনও উঠতো না পাতার সংকেতে-
গাছে গাছে তখনও লাগাতো না মধুবাঙ্গাল ঠিলা।
পাখিরাও সঙ্গম ভুলে মগডালে বসে থাকতো একাঙ গোপনে...

কেবল আমরাই চুপি চুপি তার পিছু নিতাম আর
দেখতাম তার কোমরে গুজে রাখা ঝকঝকে চাকু।
সে কি আততায়ী কোনো- এমন ভাবনাও খেলত
মনে কখনও কখনও...

সময়ের অলিন্দে সবুজ নিশানা পেয়ে কুয়াশা কাটে;
শীত তবু ছুঁয়ে যায় কামারপাড়ার আলেয়ার দেহ আর
তার মুখোশের আড়ালে স্তূপকৃত পাতা থেকে বেরিয়ে
আসে রক্তিম রবি; আমরা ছুটছিলাম তার পিছে পিছে
সময়ের ভাষা না বুঝে, দেহের গতি অনাকাঙ্খিত ভেবে।

এভাবে ক্রমেই সাদা কুবতর উড়ে যায় দূরে কোথাও
নীরবে ছুঁড়ে দিয়ে বিস্মৃতির মাঠ; ধ্বনি আর উপমা।
ফলে একদিন সব বিশ্বাস আগোছালো রোদের ভারে
হারিয়ে যায়। আমরা গোপনে বধির হতে থাকি কেবল
কোনো কামনাবতী নারী ছাড়া, যে তুলসীগাছের গোড়ায়
একটু হলেও জল ছিটিয়ে দিত সাঁঝের মায়ায়।

দিন শেষের প্রগলভা

হাওয়ায় উড়িয়ে বেলুন দেখছি
তার ওড়ার বিভাব; সমস্ত দিনে শেষে
বিস্তারিত সন্ধ্যায়- একাকি নীরবে।

মাঠের ধুলোগুলো তখনও কান্ত ছিল
গরু আর কৃষকের চাপে; ক্রমে গোপন
থেকে বেরিয়ে আসছিল শেয়াল আর ডাহুক
পাখিরা যাচ্ছিল যে যার ঘরে।
কেবল আমিই সব নিষেধ ভেঙে নেমেছি মাঠে
অলীক দুরাশায়।

মুখোমুখি চেনা মাঠ; খাপখোলা তলোয়ারের মতো
নির্বিঘেœ ঢুকে পড়ি তার সমস্ত অবয়বে- চারদিকে
তখনও ঘন অন্ধকার! ফলে পথ খুঁজে না পেয়ে
আমার আর হয় না ফেরা ঘরে
নতুন জাহাজের সংবারতায়।

বিস্ময়করভাবে জেগে ওঠার স্বাদ মনে,
অথচ মাঠ ও পথের রঙ যাচ্ছিল বদলে;
ক্রমে বদলে যাচ্ছিল আলোর গ্রীবা, ব্রীড়ানত
পৃথিবীর স্মৃতি। মনে জেগে ওঠে ভয়- সংশয়ে
বলেই ফেলি, যারা নিরুপায় তাদেরই ভীতি
কেবল নিস্তব্ধতায়, অথচ...
মারির প্রতিবিম্ব দেখি প্রতিবেশিনীর প্রত্যূষে
ভোরের মন্দিরে...

বেলুন উড়িয়ে দিয়েছিলাম হাওয়ায়।
উড়ে উড়ে যাচ্ছিল বহুদূরে...
সমস্ত দিন শেষে বিস্তারিত সন্ধ্যায়
একাকি নিরবে...

শীতের স্মৃতি

শীতের নরম কুয়াশায়
রেলগাড়িটা নিয়ে যাচ্ছিল বয়ে
একদিনের সমস্ত কান্তি
কোনো এক আততায়ী হাতের
মুদ্রিত ইশারায়;
ছুটে যাচ্ছিল গাড়ি ঘড়ঘড়িয়ে
লাশকাটা ঘরের পাশ দিয়ে।

গতি শ্লথ তার-

হীম হয়ে আসা অন্ধকারে
বুকে তুলে গুচ্ছগুচ্ছ প্রহর!
নিঃসীম তিক্ততায় একাকি
কান্নায় ভেঙে যেতে থাকে তার
আভিজাত্যের প্রাচীন শোভা!

রেলগাড়ি আসবে বলে দাঁড়িয়ে আছো
স্টেশনে; হাঁটছো আর বিড়বিড় করে
বলছো কান্তির কথা। অথচ শরীরে
তোমার মনসার ফুল; বিরহে আকুল
হয়ে পায়চারি করো সভ্যতার টানে।

কেমন জানি হলুদ হলুদ লাগে বগিগুলো আজ
কত দুঃখ যে বয়ে নিয়ে এলো...

শৈত্যপ্রবাহ

ক্ষণে ক্ষণে বিলোপনে বিলোকিত মেঘ
মাঘের আজন্ম স্বাদে ঢেলে দিল তার
কুয়াশা বিস্ময় আর একদল পাখি শিকারি
সেই পথ চিনে ঘুঘু রক্তে ভিজিয়ে দিল
চীবর সকাল!

অথচ শীত ছিল হিমাঙ্কের নিচে-
শূন্য দুই ডিগ্রি সেলসিয়াস;
পাতার কুটিরগুলো তখন ঢুকে গেছে
বেলুনভর্তি গ্যাসের আস্তাবলে।
ফলে এই শীতে কেবল আমাকেই
বিশেষ বুলেটিনে আটকে থাকতে হয়
লেপের ভেতর পার্শ্ববর্তী উষ্ণতায়।

তাপ ক্রমে বাড়ে এ-পথ ও-পথ করে
হিমাঙ্কের সঙ্গে। যত কাছে যাই যেন
বাড়ে ততই উষ্ণতা; এভাবে হারানো
পথ একদিন খুঁজে পেয়েছিলাম মাঘের শীতে।

বাঁধ

জলের বাঁধ ভেঙে যার চলে যাওয়ার কথা
সে যদি না যায় এমন মাঘের সন্ধ্যায়
তবে তারও ত্র“টি তুমি করিও মা।

একদিন বেড়িবাঁধ থেকেই দেখা যেত

পালতোলা নাও জলে ভাসছে
আমার পিতার সমান উঁচু হয়ে; বানে
আর অনুষঙ্গ টানে আজ তার দেহ
থাকে বিষাদিত- অপার যাত্রাভিমুখে।

সব চেনা, তবু যেন বাঁধ চেনা দায়
মাঘের পূর্ণিমা রাতে; কুয়াশাজালে
আটকে থাকে খাপখোলা তলোয়ার হাতে।
অথচ ওই বাঁধ, পাশের শটিবন, বাদাম আর
কাশবন- শিশির পড়ে যার পাতা ফিরে পায়
পুনর্জীবন, সেখানেই আমার পিতা, পিতামহের
দীর্ঘশ্বাসে এক সময় ভারি হতো আশপাশ!

সব চেনা, কেবল বাঁধ চেনা দায়
প্রতি বছর ভাঙে আবার গড়ে ওঠে
নতুন করে পরমাত্মীয়ের মতো।
আমরা বসে থাকি তার পাশে
জেগে জেগে ঘ্রাণ নিই পিতামহের শ্বাসের।
এভাবেই কত রাত আর মাঘের চাঁদ
আমাদের সঙ্গে কাটিয়ে দেয় নির্ঘুম-

সব চেনা, সদ্য বেড়ে ওঠা বাঁধের ঘরও,
কেবল অচেনা যমুনা বোন আমার-
নিজেরই শরীর ধুয়ে আবার গড়ে দেয়
ধুলোমাটিপথ...

আমরা জেগে থাকি-
বসে থাকি নতুন বেড়িবাঁধে...

ক্রিয়া সংক্রান্ত

চেনা- তবু যেন সবই লাগে অচেনা।
ঘর, যাপিত জীবনের মুখস্ত সংসার,
আশপাশ, সবুজাভ ফসলের মাঠ, ঘুঘু
কবুতর আর পিতৃপুরুষের রাঢ়াঙ মুখ!

চেনা, তবু যেন সবই লাগে অচেনা।
বাজারের সড়কপথ, গৃহস্থবাড়ি, তাদের
প্রাত্যাহিক চাহিদা, মায়ের কান্ত মুখ,
তাঁতিদের হাড়মাস করা খাটুনি আর মহাজনের
কড়কড়ে নোট-

তবু ভুলেও চিনতে পারি না আদিভূমের নীলকুটি,

যাবতীয় অত্যাচারের স্মারক হয়ে যেটি নিশ্চিহ্ন হয়ে পড়ে আছে ছোট্ট জলাশয়ে- আমাদেরই পিতৃপুরুষের রক্তরণে...
অথচ কত সবুজ আজ এর চারপাশ, আখতে, সরিষা
ধানের মাঠ। কখনও কী কেঁপে উঠতো দস্যুতার ছুঁতোয়?

তবু ভুলে যাই বিধ্বস্ত নিলীমা; সন্ধ্যার অবকাশে নিয়ন
আলোয় খেলা ব্যাডমিন্টন কিংবা দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে
তুমুল আড্ডার কথাগুলো। কখনোই মনে করতে পারি না
সেসব, হয়তো আমাকেও কেউ মনে রাখে না।

আমরা পরস্পর ভুলে যাই ফেলে আসা সব স্মৃতি
পরস্পরের ব্যক্তিগত মনন, চৈতন্যবোধ
নিঃসঙ্গ অনুভূমে বিস্তরঙ্গে
পরস্পরের অনুকম্পন, রণন...

ক্রিয়া সংক্রান্ত দুই

বড় বড় গাছ কেটে ফাঁকা;
গোপনে গমন পথ যারা আজ
করছে নিরঙ্কুশ ছোট
হাঁটাচলার পথকে নিরাবয়ব,
পেছনের বালুমাঠ ঠেলে আগত
ভাঙনের নদী দ্রুত আসছে ধেয়ে
একাকি খেয়ে সব!

তবু আসে ফেরত থাম এক
সাপেকাটা পিতার দায়গ্রস্ত হাতে;
চারপাশে ভিড় করে কাঠ বিড়ালি
তাদের সংসারে খোঁজ পড়ে প্রত্নরত্ন।
ফলে চোখ কেবলই তাকিয়ে রয়
অনতিগম্যে প্রতিনিয়ত চাপে।

পিতা দেখলেন লাশকাটা ঘর
শ্মশান-কবর থেকে উঠে আসা
সীসা মোড়ানো শহর
তাকে ডাকছে তার পিতা। বলছে :
ফিরে আয় খোকা আমার মতো
তপোজল যমুনায়
মায়াপাশ ছিঁড়ে একাকি
মারকিন কাপড়ে...

ফলে আমরা ছুটে যাই
পিতার সঙ্গে চির ধরা

বড় গাছটার কাছে,
যে ছায়া দিত অকৃত্রিম;
ঘোর লাগা জ্যোস্নারাতে
যে শুনিয়ে দিত মুক্ত হাওয়ার গান!
আজ তারই প্রাণ নিল কেড়ে!

নিষিদ্ধ প্রহর কুটে
মরাগাছটির পাশ দিয়ে
সাঁইসাঁই করে চলে যায় শবের গাড়ি।
আমরা পিতার পাশ থেকে
শুনি তার ভীষণ চিৎকার
সঙ্গে কাকের আহাজারি আর
মানুষের আর্তনাদ!

যমুনা, বোন আমার
প্রতি বছর তুমিও তো বানজলে
টেনে নিয়ে যাও এমন
অসংখ্য গাছ। কই, কেউ তো
নালিশ করেনি কখনও।

অথচ কি অবলীলায়
নিঃসঙ্কোচে মানুষের
হাতে ধরা খেলো গাছটি
আজ আবার

প্রিয় বোন আমার,
তুমি আবার আসো
পৃথিবীর ভাঙন উন্মুক্ত করে
ক্রমে... তোমাকে সংবর্ধনা দেবো।

কলের গান
এই যে চায়ের কাপে
হাসিগুলো ধুয়ে নিলে
নানান ভাঁজে জমিয়ে
রাখা উষ্ণ লালায়
মেঘ যদি আজ ধাঁধায়
ফেলে আধোবিন্যাসে
আধো আলোয়
ক্রমে তুলে নেয়
সবটুকু তৃষ্ণা তোমার
তবে?

প্রতিমা বিষাদে আমারও

পাঁজর-হাড় খুলে যাবে
মুখরিত গ্রামসার্কাসে;
তোমার চায়ের কাপে
ভেজানো উষ্ণ লালায়...

পথের ধুলো পায়ে হেঁটে
আমি তো কান্ত নই!

সকাল
নদীর মতো
চলে নিরবধি
যাপিত জীবন সংসারে।
তার খোলস ভাঙা দায়;
হাত পুড়ে যাওয়ার সম্ভাবনা থাকে।

কুয়াশাভর্তি নারীর সঙ্গে ওঠে
জোয়ারের মতো ইডেনের গেটে
আসে আর যায় একাকি নিরবে।
রৌদ্র বিছালে ওই পথ আর দেখা যায় না
কারও কারও কোলাহলে!

এই পথ ধরে আমরা যাই আর আসি
বাসনার বিপুল সম্ভবে,
দয়িতার মুখ দেখে কেউ কেউ হাসি!

নাগিনী

ফোনায় খেলা করে ঢেউ
মুক্তো তবু সরে না
কেবলই কাঁপে
আলগা করে শরীরের বাঁধন
আর করে ফোঁসফোঁস

চোখের কোটরে শুকতারা ভাসে
নরম শিশিরে ফেলে দীর্ঘশ্বাস,
বুঝি না সাপিনীর মনে কি?
ঘুমাতে সঙ্গে রাখে তক্তোপোষ!

পানকৌড়ি

কালো পোশাকে থাকে পাখিটি
জলের অতলে যায় না
উপরেই ভাসে আর

ছোঁ মেরে তুলে নেয় ছোট ছোট মাছ।

জলে টইটুম্বুর হলে নদী বা বিল
নতুন পানিতে খেলে সাঁতার খেলা
মনে তখন সকল ঢেউয়ের গান

ও পাখি মৎস্যগন্ধ এবার আমারে দে ...

পথ

তাকে রোধ করো পথ, ডুবলে বিপদ

কান্নার জলে ধেয়ে বান আসিতেছে
বৃষ্টির জলে ধেযে বান আসিতেছে
পাড় ভেঙে ঘরে নদীর স্রোত আসিতেছে

তাকে রোধ করো পথ, ডুবলে বিপদ

সমূহ সংকেতে ডুবে গেলে জলে
পথ আর চেনে না পথিক ছিল কে

উড়ালপঙ্খি

খাঁচা ভেঙে যে পাখি দিয়েছে উড়াল, ওকে উড়তে দাও আরও

নগরের সব কতোয়াল যে যার দায়িত্ব ভুলে আজ খেলতে এসেছে মাঠে
বাজারে জিনিসের দাম উপরে উঠতে উঠতে আকাশ ছুঁয়েছে প্রায় আর
গৃহস্থজনের কাজকর্ম নেই বলে সেও উদাসীনÑ ঘুরছে বনে-বাদাড়ে!

খাঁচা ভেঙে যে পাখি দিয়েছে উড়াল, ওকে উড়তে দাও আরও

উড়ে উড়ে যাক পাখি দূরে কোথাও প্রতিবার যায় তো প্রবাসে...
ডোডো পাখি হওয়ার আগেই তাকে দুটি কথা বলার সুযোগ করে দা

ঔঁ কবিতা

মুহূর্ত ফেরি হয় কারও কারও হাতে

চোখ কান খোলা রাখবেন তো সব জেনে যাবেন
কীভাবে বাজারে জিনিসের দাম বাড়ে আর কমে।
বাড়া-কমার সঙ্গে যেহেতু আপনারও ওঠানামা
মুহূর্ত ফেরি হয় কারও কারও হাতে
অতত্রব কোন দেশি টুথপেস্ট ব্রাশ দিয়ে দাঁত মাজবেন

খিলিপান মুখে পুরে হি-হি-হা-হা করে হাসবেন
তা নিরঙ্কুশ আপনাকেই ঠিক করে নিতে হবে;
গোয়ালের গরু তো আপনারই ভালো করে চেনা।

তবু বাতাসে মুহূর্ত ভেসে যেতে যেতে ব্যঙ্গ করে হাসে
আর জনাকীর্ণ রোদে কবিতা পড়ে :
ওঁ কবিতা শান্তি ওঁ...

মার্চ ২০০৯
কান্নার শহর আর নয়

ইচ্ছে করে সব ছেড়ে চলে যাই দূর কোনো গ্রহে
অথবা সব ছুঁড়ে ফেলে দেইÑ ভেঙে ফেলি দ্রোহে
অথবা ঘুরিয়ে দাঁড়াই মাঠের বিরুদ্ধে হয়ে মাঠÑ

কান্নার শহর আর নয়

কাঁদছে কাঁদুক যাদের কাঁদার কিন্তু আঁধার আর নয়
পুড়ছে পুড়–ক যাদের পোড়ার কিন্তু রাধার ছাড় নয়

দুই.

তোতা বুলি আর কতদিন
বিদেশি পালোয়ান আসছেন গায়ে দিয়ে আলেয়ান
চাপাস্বর নিচু হয়, মনে শুধু সংশয় সব যদি জেনে যান!

আলেয়ানের বাতাসে সব মুখ ফ্যাকাশে!

তোতা বুলি আর কতদিন
ধরাপাতা আর কতদিন
আর কত...

তিন.

ভয়, সতত সংশয় মনে

প্রতিদিন শোকের স্মৃতিচিহ্ন নিয়ে যারা ফিরে আসে ঘরে
প্রতিদিন ভোগহীন দেহ যাদের পীড়িত করে অনাহুত
ওরা আমাদের স্বজন মা-বোন, নিকটাত্মীয় কেউ কেউ

অনাগত দিনে, দিবসের ণে ণে
চোখে ভেসে ওঠে বাজপাখির ডানা;

সব হারিয়ে গেল...
বাতাস এসে উড়িয়ে নিয়ে গেল সব!

প্রজাপতি, ফুল আর বিষণ্নতা আজ তাদের সঙ্গী যেন

জানা নেই

দূরত্বের ওপারে কী জানা নেই তরুণ বালিহাঁস।
মাঝে মধ্যে এপার থেকে দেখি কেবল ওপারের ঘনশ্যাম
বর্ণের ওপর ঠিকি হয়ে শুয়ে আছে দুগ্ধধবল গাই;
দোহাতে জানি না, তাই কাছে তার হয় না ফেরা।

দূরত্বের ওপারে কী জানা নেই প্রবীণ সারস।
গেঁথে তো দিয়েছো গায়ে বাজারের উষ্ণতা
ব্যস্ত নগরীর স্তন থেকে চুয়ে পড়া নিয়ত আলো;
মুগ্ধ হতে গিয়ে কত হাত পুড়ে গেল চোখের ভুলে!

দূরত্বের ওপারে কী তোমারও তো জানা নেই মাছ।
আঁচ করো শুধু : মহাসমুদ্র তোমার, বিশাল মাঠ তোমার
বাজার, টঙঘর তোমার, উত্তাপও একান্ত তোমার
উদ্ধত পুরুষগণ তারাও বাঁধা আজ গাছের শিকড়ে শিকড়ে

তবু কাঠের মাস্তুল ভেঙে যদি হারিয়ে ফেলে কেউ সমুদ্রের দিশা
অপবিত্র হতে হতে আরও গৌণ হয়ে যাবে চাঁদ, তারা সবাই...

স্বপ্নরোদের অতিথিরা

সহোদর চোখ কেন্দ্র হতে বিচ্যুত।
তাই শোককে মন্ত্রে জপি
অন্তর্গত মুখস্ত অভ্যাসে।

বিশাল ভাঙনমুখে ভেবে নাও আপাতত
কোনো নিঃসঙ্গ তারকারাজির কথা
জড়োসড়ো হয়ে কোনো কোনোটি কেমন
মিটিমিটি জ্বলে অথবা ভাবতে পারো কোনো
উদাসীন কুয়াশাভোরের কথা অথবা অবরুদ্ধ
দিনের বিস্মৃতি মৃত পাখির নিথর পালকের মতো
ভেসে যাচ্ছি হিমশীতল অন্ধকারে...

প্রবল স্রোতের ধার হতে উঠে আসছি দ্রুত
মাতালের মতো... চারদিকের অস্থিরতা নিয়ে।
মনে করো, অনন্ত দুরাশায় সমস্ত শরীর

নির্ভীক ভক্তিতে বিষাক্ত হয়েছিল কেবল
স্বপ্নরোদ আর নিরুপম সত্যাগ্রহে।
মহাত্মা ছিল না সঙ্গে, তবু...
আঁধার গায়ে মেখে কাঁধেই নিয়েছিলাম
পুরো গৃহস্থালি, স্নানঘর;
আঙুল উর্ধ্বে তুলে বলেছিলাম :
যাবই এবার অনুর্বর ক্ষেতে।

কিন্তু সাঁতরে উপরে ওঠার আগেই হয়ে যাই
বাঘবন্দি কতগুলো জানোয়ারের সঙ্গে।
আকাশে ভাসছিল তখন শুভ্র সুন্দর ঘোড়া;
ওরা জানতো নিস্তব্ধরাতের কুয়াশাপ্রণয়ের কথা।
তাই ঘোর ভেঙে চিল আসে উড়ে
ঠোঁটে তুলে নেয় মুরগিছানা আর
কান্তি ও ভ্রান্তির গুপ্তদাঁতে
ছড়িয়ে দিয়ে যায় আরও কিছু কামনার বিষ!

চরে গিয়ে থামি, ঢুকে পড়ি কাশবনের ভেতর।
গুচ্ছগুচ্ছ ঘরে তখনও বসে আছে
বিদেশি বণিক দল
চাষ করছে আমাদেরই ঘাম!

সহোদর চোখের বিরহে সবাই স্বপ্নরোদের অতিথি...

নিঃসঙ্গতা
তার কাছে যাই, তার হাতেই খাই
লোলপড়া অমন সূর্যের মুখ!
গৃহস্থবাড়ি মনে হয় সব বাড়াবাড়ি
সরলরেখার বিবরে বিরহী কাতর।

তবু ওই পথে যাই ঢেকুর খেতে খেতে
হাই তুলি
তারে দেখি না অবলীলায়
জনাকীর্ণেও পড়ে না তার
পদধূলি!

সারাদিন ধান কুড়ানোর দিনে
সে মাঠের যাবতীয় খড় চিনে
আমারে নিয়ে যেত দূরবাসে
প্রবাসের ছবি এঁকে দিত চোখে:
দুই ভাই থাকে দুবাই
মাসে মাসে টাকা দেয় আর
সাথে দেয় গরম বাতাস...

সূচিভেদ্য অন্ধকারে
তুমি আর এসো না কাছে
ফিরে যাও মুণ্ডুমাথা...
গাধা কোথাকার, হাদারাম...

বিধিবাম; মা-বাবা গেছে জেনে
আমি হবো সূর্যকুলি!
উদাসি হাওয়া ফেরি করে
অন্ধের সন্ধিহান চোখে :
এমন কিন্নর ছেলে রে বাবা!
বুড়ো মা-বাবা ফেলে চলে যাবে
দূর প্রবাসে!

দরিয়ার টানে বিচ্যুত বোধ তবু
চোরাগুপ্ত রাতে ঘাতক ছায়ার সাথে
ফিরে আসে হিম হয়ে একা
নিঃসীম শূন্যতায়...

কুড়ি বছর পর
জলের অতলে ডুবে ছিল গাছ
মৃত শাঁস নিয়ে
পড়ে ছিল কুড়িটি বছর!
অথচ সংবাদ নেই
কুয়াশার ভেতর
মাংসাশী মাছের গল্প ছাড়া।

পুকুরের পাশেই থাকতো আমাদের
গোয়ালের গরু, তার পাশে আমগাছ
বল্লার গাছ আর অরহর বন;
শীতলপাটি ফেলে সেখানে ঘুমাতাম
আমরা কোনো কোনো দিন।
জলের অতলে ডুবে ছিল গাছ
মৃত শাঁস নিয়ে পড়েছিল
কুড়িটি বছর!

শেয়াল আসতো শেয়ালির সাথে
বিড়াল আসতো বিড়ালির সাথে
আরও আসতো হায়েনা বুঝি!
চাঁদ চলে গেলে আমরা তখনও
অমাবস্যা খুঁজি
বোকার মতো অপলক চোখে :
কে ঘাটে এলো আর নামলো জলে
দু'হাতে সরিয়ে দিয়ে অসংখ্য ঘাসপানা

কত ঘাসপানা জড়িয়ে নিল তাজা তাজা বেলুন ছানা!

হায়েনা আসতো, সাথে মাংসাশী মাছ!

নিরুদ্দেশে হাসতো তখন কৌতূহলী চোখ;
বেলুনসমেত ধোন খুঁয়ে ভূতজনের শোক
প্রস্তাব আসে ভাঙা গাড়িতে চড়ে।
জলের অতলে ডুবে আছে গাছ
মৃত শাঁস নিয়ে কুড়ি বছর ধরে!

প্রণতিবিধান

মোরগ জেনে গেছে ঘরে ফিরে খিল আটকানো বৃথা।
শিয়রে ধুলন্ত পেণ্ডুরাম, হয়তো ঘরেই শেখা যাবে বাকভাঙা গান
কিন্তু শিয়ালের শিৎকারে গুমোট অন্ধকারে দেহলভী প্রাণ
প্রবীণ হয়ে যায় বিবিধ সরলাঙ্কে
কোন রঙ যে মেখেছিল গায় ভোরে ব্যসনের আমাত্যবেষ্টনে!
তবে ধ্র"পদী গানে কৌটিল্য জেনেছিল সংসারের সূচিত ফুট ফরমাস।
সোনালি ধানের ঘ্রাণ টেনে নেওয়া প্রবক্তা কৃষকের মতো খড়ের তত্বকথা;
প্রবল ছিল না তখনও নৌকা না বাওয়া নদীতে গুণটানা মাঝিদের ঘাম
অথবা পানের বরজে বরজে সুতোতে একেলা বেড়ে ওঠা...

সব চিঠি পাঠানো যায় না ডাকবাহকের কাছে মোরগ সংসারে;
প্লাস্টিক বয়মে মসলা পেষানো স্তন শুধু নাগরিকের জন্যই তুলে রাখা!
ঝুল বারান্দায় শশব্যস্ত মেঘ, নিজেদের কৌশলে নিজেরা ছোটে
ধরে রাখে পোয়াতি ওম
তারাও জেনে গেছে ঘরে ফিরে মোরগের খিল আটকানো বৃথা!

ভাষাবন
বাঁচা গেল তবু একথা ভেবে যে,
পরিশেষে জেনে গেছো ভাষাবন
বলে আসলেই কোনো কিছু নেই।
কিছু মিথ্যাবাদী অসৎ জুয়ারি
আর চাপা মারে যারা বাজি ধরে
তাদের কাছেও শব্দটি যোগ্য
কিনা, জানা নেই তার বৈধতাও।

প্রিয় ভাষাবিদ, পকেটের ভাঁজে
নতুন করেই রেখে দিতে হয়
সনাতন কিছু ; ধুলিপড়া শব্দ!
যদি জ্বলে ওঠে জোনাকি আলোয়

জেনে নিও প্রিয়, তার মানেটাও।

অয়োমুখী

শেষ কথা বুঝি না বলাই ভালো
আসলেই শেষ বলে কিছু নেই।
তাই কেউ বা যদি কিছু সুধালো
বলিÑ ভাই, আহা! হারিয়েছি খেই

দুর্মতি ষাঁড়েরও আছে
বাগে পেলে চেপে ধরে গাই
হার-জিদ আছে বটে, পাছে
তলে পড়ে বলে যাচ্ছেতাই!

আসলেই মত বলে কিছু নেই।
অপোয় থাকি তাই রাতদিন
ধারণাতে যোগফল মিললেই
অয়োমুখী হাতে তুলে নেবে বীণ!

চারদিকে মিথ্যাবাদে ছড়াছড়ি
জল পেয়ে কেউ বেশ করে হাসে
ধানে ফুল নেই, তবু দরাদরি
হিসাব কষে অয়োমুখী; বাতাসে!

তার মানে

তার আর মানে কী হতে পারে?
ধরো, ‘বাঘ গেল শেয়ালের কাছে
ঘাড় টান করে বলল... আরে,
পাজি তুই বল আমারও আছে...

হেসে আর কেঁশে শেয়াল শেষে
বলে দয়াময়, প্রভুর সকাশ
আপনার সাথে যারাই মেশে
রঙ-তামাশারই অবকাশে...’

মহাশয়, বেয়াদবি নিয়েন না
আপনার পাছাখানা বেশ খাসা!
শুধু শুধু যাকে-তাকে দিয়েন না,
পাছে দুর্গন্ধ বের হবে শাঁ শাঁ...

রক্তাক্ত হলো, হবে আরও

বাঘ থেকে হবে বাঘিনী
কোঁচের ছুরি কাটবে ঘাড়ও...
ফোনা তুলবে কাল নাগিনী!

অমীমাংসা

মৌজ-মাস্তি শেষে বসা হলো আলো-অন্ধকারে। বলা হলো প্রসঙ্গক্রমে, সবার সম্ভোগ উঠে আসুক আজ রাতে। সুতরাং আমাদের আলোচ্য বিষয় যৌনসম্ভোগ হতে পারে। কিন্তু বক্তারা ছিলেন ভীষণ ব্যস্ত তার রসাস্বাদনে। ফলে নারী যে বক্তাটি এসেছিল যাপিত সংসার কাঁধে নিয়ে, তাকেই ধরা হলো আলোচ্য বিষয়ের সুষ্ঠু মিমাংসা দিতে। কিন্তু সে পৃথিবীর যাবতীয় উৎকন্ঠা বুকে টেনে নিয়ে বলল, এই যে দেখ আপেলটি। একদিন কুঁড়ি পর্যায়ে ছিল। ক্রমে তার বয়স বাড়তে থাকায় সবার নজরে এলো। হাত দিল কেউ কেউ তাতে; সজোরে, আস্তে আস্তে টিপে দিল কেউ। আর কি আশ্চর্য, দেখতে দেখতে আপেলটি বড় হয়ে গেল! এখন এটি চাপ দিলে রস বের হয়। এভাবেই ধর বিষয়টি আর...

থেমে গেল বক্তাটি সম্ভোগের অপার সম্ভাবনায়। ফলে আর বক্তা না পেয়ে ঢুকে পড়ি শান্তিনগরে। যদি রবীন্দ্রনাথকে পাই, তাহলে তার কাছ থেকেই জেনে নেব সম্ভোগের আপেল থেকে রস পড়ার বিপুল রহস্য। বউ ঠাকুরানীও কী তাকে দেখিয়ে ছিল টসটসে বাঁধানো আপেল! কিন্তু ব্রা-এর ফিতে ছিঁড়ে ঝুলেপড়া এই সম্ভোগ শহরে রিকশা, ভ্যান আর লোকে ঠাসা বাসের ভিড়ে আমি ভুলে যাই যৌগসম্ভোগ মানে আপেলটির নিরঙ্কুশ কথা। দ্যাবা পৃথিবীও কী আমারই মতো ভুলে যায় সব?